বিপুল উদ্দমের সাথে ভারতে চলেছে ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস পালনের আয়োজন। বর্তমানে এই দিনটি আমরা অনেকেই উদযাপন করি একটি খুশির দিন হিসাবে... প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠী, রাজনৈতিক কারণে যা আজ দ্বিখণ্ডিত। আমাদের অর্ধাংশ আজ বাংলাদেশে। যেমন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন অসংখ্য বীর বাঙালি সন্তান, ঠিক তেমনই এই দিনটিতে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার নায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে। তাই সত্যিই কি এটা বাঙালির কাছে উৎসবের দিন?

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

কলম হাতে

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, প্রণব কুমার বসু, ডাঃ অমিত চৌধুরী, মালা মুখার্জী, নাহার আলম এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩
অগাস্ট ২০১৯

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য, পদ্য, নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

©Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

দূরের জানালা

(পর্ব ৩)

হাওড়ার 'দক্ষিণায়ন' নামক নাটকের দলটির সাথে যুক্ত ছিলেন মাস্টার মশাই শ্রী অমিতানন্দ মৈত্র। সাঁতরাগাছিতে উনি 'অমু'দা নামেই সুপরিচিত ছিলেন। সারাদিন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, উনি হয়তো বেশি নাটকে অভিনয় করতে পারেননি, কিন্তু ওনার লেখা অনেক নাটক দক্ষিণায়নের সদস্যরা মঞ্চস্থ করেছিল। প্রশান্ত বাবুর কাছে জানলাম, সাঁতরাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে (সম্ভবত ১৯৭৪ সালে), দক্ষিণায়নের হয়ে উনি একটি নাটকে রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় অভিনয় করে সব দর্শককেই মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই নাটকে, ওনার বাচনভঙ্গী ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।

স্যার অমিতানন্দ মৈত্রর সাথে রাজশ্রী দত্ত...

তাছাড়া, ছোটদের জন্যও বেশ কিছু সুন্দর নাটক উনি লিখেছিলেন। সেই নাটকগুলোর মধ্যে, বেশ কিছু সাঁতরাগাছি

কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়। অমিতানন্দ স্যারের সহকর্মী ও 'গুঞ্জন' এর আর একজন পৃষ্ঠপোষক শ্রী শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্যার জানালেন, "কি সুন্দর নাটক লিখতো অমু। স্কুলে অভিনীত অমুর প্রত্যেকটা নাটকই দর্শকদের কাছে সুপ্রশংসিত। ওর লেখা ও নির্দেশিত নাটক মানেই 'হলে পিন ড্রপ সাইলেন্স'। 'সেলফিস জায়েন্ট', 'আলাদীন', 'শ্রীনাথ বহুরূপী'... এই সমস্ত বিখ্যাত কাহিনীগুলোকে ছাত্রদের অভিনয়ের উপযোগী করে এত সুন্দর নাট্যরূপ দিত অমু, যার কোন বিকল্প হয় না। স্কুলের স্বল্প বাজেটের মধ্যে এত সুন্দর করে নাটক পরিবেশন করা, একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব ছিল।"

'গুঞ্জন'এর প্রথম কয়েকটা সংখ্যার প্রুফগুলো, নিজের হাতে সংশোধন করে দিতেন অমিতানন্দ স্যার। এত ব্যস্ততার মধ্যেও একজন প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমী মানুষ যে কিভাবে সময় বার করে নিয়ে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হতে পারেন, উনি তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ওনার এই ছাত্রদের সত্যিই উনি দিয়ে গেছেন অফুরন্ত অনুপ্রেরণা, যার জোরে এত বছর পরে আবার ফিরে এসেছে 'গুঞ্জন'।

দুর্ভাগ্যবশত, গুঞ্জন'এর প্রথম ই-সংখ্যার কাজ চলাকালীন সময়েই অমিতানন্দ স্যার অমৃতলোকে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সাথে রয়েছে। সেটাই আমাদের মহান অনুপ্রেরণা।

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় – সহ-সম্পাদিকা ■

কলম হাতে

কলম হাতে

গুঞ্জনের বর্তমান সংখ্যাটির প্রকাশ কালে মাননীয় শ্রী পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, তার জন্য পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে ওনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।
বিনীত
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

পাঠকের দরবার

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, সাহিত্যিক

মাসের শেষে হাতে পরে টান আর মনের ভেতর তোলপাড় হতে থাকে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে গুঞ্জন পড়ার নেশাটা। অনিবার্য কারন বশতঃ জুলাই সংখ্যাটি হাতে পৌঁছাতে এক সপ্তাহ দেরী হয়ে গেল। তাই বলে পড়ার নেশাটির দেরী হয় নি। এ মাসের সংখ্যাটিতে যা পেয়েছি —

১। অলঙ্করন - প্রতিবারের মতোই প্রশংসার দাবী রাখে।

২। রাজশ্রী দত্তের "বর্ষার ইতিকথা" লেখাটি মনোগ্রাহী। প্রশংসার দাবী রাখে।

৩। মৌসুমী লাহিড়ীর "বিষাক্ত" লেখাটি সময়োচিত লেখা, বেশ ভালো।

৪। সরজিৎ মন্ডলের "বৃষ্টি" লেখাটি পড়তে ভালই লেগেছে।

৫। ডঃ অমিত চৌধুরীর "শিব দুহিতা নর্মদা" পড়তে পড়তে পড়তে মনে হলো হঠাৎই যেন তানপুরার তার ছিঁড়ে গেল। আবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা।

৬। অনির্বান বিশ্বাসের "অন্তর্দহন" লেখাটি ভালই।

৭। মালা মুখার্জীর "ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল" লেখাটি খুবই মনোগ্রাহী। নীল শহর কেন নীল তার বর্ণনা থাকলে আরো ভালো লাগতো।

৮। প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বর্ষাতে" লেখাটি নিয়ে নুতন করে কিছু বলার নেই। পি. কে. র লেখা মানেই এক অন্য মাত্রা।

৯। ওমর ফারুক চৌধুরীর "বর্ষা" লেখাটি বেশ ভালো।

১০। শরণ্যা মুখোপাধ্যায়ের "থানা থেকে আসছি" লেখাটি খারাপ নয়।

১১। প্রণব কুমার বসুর "পাজি" নিয়ে নুতন করে করে কিছু বলার নেই। ছড়ার রাজা মহারাজা তাকে নিয়ে লেখা মানে আমার কাছে ধৃষ্টতা।

১২। প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্যের রম্যরচনা "একটি গনতান্ত্রিক ফাঁসি" লেখাটি মনোমুগ্ধকর।. . . ■

প্রণব কুমার বসু, কবি

আমিও গুঞ্জনের সাথে লেখক হিসাবে যুক্ত, তাই দু'একটা বিষয়ে সম্পাদক মণ্ডলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গুঞ্জন এর জুন ও জুলাই ২০১৯ সংখ্যা দু'টি পড়লাম। জুলাই এর ভ্রমণ কাহিনী দুটোই ভালো লাগল।

Page এর background এক colour & light colour এর হলে ভালো হয় – আমার মতো হয়তো অনেকেরই পড়তে সুবিধা হবে।

এক এক ধরনের মানুষ এক এক ধরনের লেখা পছন্দ করেন – কেউ গল্প, কেউ উপন্যাস বা কেউ কবিতা - আমি কারও লেখা খুব বেশী পছন্দ হয়েছে বললে অন্যান্যদের অসম্মান করা হয় – সব শিল্পীই চেষ্টা করেন তাঁর সৃষ্টি যেন সব থেকে ভালো হয়।

একটা হাস্যকৌতুক বিভাগ থাকলে মনে হয় মন্দ হবেনা। ■

পাঠকের দরবার

দীপঙ্কর সরকার,
লেখক, বাংলাদেশ

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় যখন হোয়াটস এ্যাপে 'গুঞ্জন' (জুলাই ২০১৯) সংখ্যাটি পাঠালেন, তখন খানিকটা অবাক হয়েছি। অনেক মাসিক পত্রিকা পড়েছি, কিন্তু ই-পত্রিকা বিষয়টা খুব অবাক করেছে। পত্রিকাটি খুলে চমকে গেলাম। প্রথমত এর ডেকোরেশনের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এতো সুন্দর করে লেখাগুলো সাজানো যা যেকোনো পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম। তারপর এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম পত্রিকাটি। এর প্রতি ভাঁজে ভাঁজে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। লেখাগুলোর সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই, তবুও দু এক কথা না বললেই নয়।

বর্ষাঋতুর গুঞ্জন সংখ্যাটি শুরুই হলো রাজশ্রী দত্তের 'বর্ষার ইতিকথা' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। সেখানে উঠে এলো কালিদাস হতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাবন্দনা যা পাঠকের মন ভরাতে সক্ষম। তারপর, মৌসুমী লাহিড়ীর 'বিষাক্ত' কবিতার কথা না বললেই নয়। কবিতার মাধ্যমে তিনি একটি বার্তা দিয়েছেন। কবির সেই বার্তার সাথে আমিও একাত্মতা ঘোষণা করছি।

বর্ষার মাসে বর্ষার কবিতা হবে এটাই প্রাসঙ্গিক। বর্ষার চিরচেনা রূপ উঠে এলো ‘বর্ষামঙ্গল’ হয়ে সরজিৎ কুমার মন্ডল, প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.) ও ওমর ফারুক চৌধুরীর কবিতায়। ডাঃ অমিত চৌধুরীর 'শিব দুহিতা নর্মদা' লেখাটি

পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। এছাড়াও মালা মুখার্জীর 'ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল' ভ্রমণকাহিনীর কথা না বললেই নয়। আমিও লেখিকার সাথে ঘুরে এলাম রাজস্থান থেকে। লেখিকার কলমে উঠে এলো রাজস্থানের ইতিহাসও।

অনিবার্ণ বিশ্বাসের 'অন্তর্দহন' কবিতাটি খুবই ভালো লেগেছে। প্রত্যেকের মাঝে সে দহনটা আছে বলেই পাঠকের আত্ম-উপলব্ধির সাথে কবির ভাবনা মিলে যায়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাসের লেখার ভক্ত। তাঁর সাধুরীতিতে গল্প লেখার ঢঙ আমায় সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। তাঁর লেখা 'বান্ধবী' গল্পটি প্রত্যেক পাঠককে স্মৃতিময় জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম।

এছাড়াও প্রণব কুমার বসুর 'পাজি' লেখাটি নতুন করে আর একবার স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ করে দিল পাঠকদের। যেখানেই ওনার লেখা পাই সেখানেই পড়ে ফেলি। এছাড়াও ‘থানা থেকে আসছি’, ‘ছায়াকায়া’, ‘একটি গণতান্ত্রিক ফাঁসি’ লেখাগুলোও মন কেড়েছে। সবমিলিয়ে পরিপূর্ণ পত্রিকার যা গুণাবলি থাকে তার সবটাই গুঞ্জনে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো প্রতিটা লেখার উপর - 'মনের কোণে', 'চেতনা', 'চিরাচরিত', 'আশা নিরাশা', 'রোমন্থন' শব্দগুলো জুড়ে দেওয়ায় পত্রিকাটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

গুঞ্জনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। আর কথা না বাড়িয়ে পরের সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। ■

যান্ত্রিক জীবন

মৌসুমী লাহিড়ী

মি যখন কলেজস্ট্রিটে বইয়ের আর্কাইভে,
তুমি তখন খুব ব্যস্ত থাকো সেক্টর ফাইভে।

আমি ভরে থাকি কবিতার রঙের আভায়,
তুমি ডুবে থাকো প্রোগ্রামিংয়ে জাভায়।

আমি চাই শোনাতে কিছু কবিতা স্বরচিত,
কবিতা শোনার তোমার সময় নেই তো।

কোথায় হারিয়ে গেল তোমার সেই গিটার?
বাজিয়ে শোনাতে যদি আর একটিবার...

কোথায় হারালে সেই ক্যানভাস ও তুলি?
সেসব দিন বলো কি করে আমি ভুলি?...

চলো চলে যাই যান্ত্রিক জীবন থেকে দূরে।
শান্তিনিকেতনে থাকি বাউলের সুরে সুরে। ■

আপনি কি আপনার কোম্পানির উৎপন্ন পণ্যের বা পরিসেবার কথা সবাইকে জানাতে চান?

'গুঞ্জন' আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে...

সেলফোনঃ +৯১ ৯২৮৪০ ৭৬৫৯০

ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com
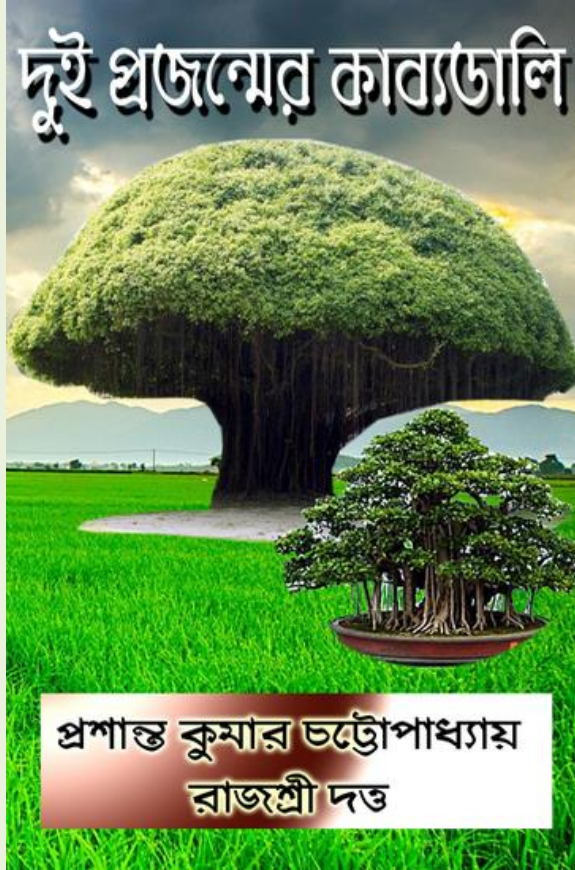
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও

অমিত নাগ (আমেরিকা)

বাবার হাতের লেখা ছিল ছাপা অক্ষরের মতো সুন্দর। ক্যালিগ্রাফি নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতো। আমাদের ফটোর এলবাম অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের বইয়ের মলাটে লেখা নাম দেখতে হতো অন্যদের থেকে অনেক সুন্দর। তখন ফটো অ্যালবামের পাতাগুলো হতো কালো রঙের, তার ওপরে অর্ধস্বচ্ছ পাতার আবরণ। চারটে কর্নার পিস দিয়ে ছবি আটকানো - এক একটা পাতায় একটা, দুটো বা চারটে সাদা কালো ছবি - সাইজ অনুযায়ী সাজানো। পাতাটার বাকি খালি কালো অংশে বাবা সাদা রং এর তুলি দিয়ে টুকটাক ছবি বা অলংকার এঁকে দিতো। ফুল, নৃত্যরত ময়ূর, খেলনা হাতি ঘোড়ার মোটিফ। কখনো বা ফোটোর থিম অনুযায়ী অলংকরণ। পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ফোটো হলে, সাদা রঙে আঁকতো বরফে ঢাকা পাহাড় চুড়ো, পাইন গাছ, পাথরে ধাক্কা খেয়ে উছলে ওঠা পাহাড়ি ঝর্ণা, পাকদন্ডী দিয়ে চলা ঘোড়া। আর সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর ফোটো হলে, সফেন ঢেউ, বালিয়াড়ি, ঝিনুক, চোঙা টুপি পরা নুলিয়া আর তার নৌকো, স্টার ফিশ, শাঁখ এই সবের ছবি। সে সব

অলংকরণ অ্যালবামের আকর্ষণ বহুগুন বাড়িয়ে দিতো। নতুন বছরে নতুন বই বাবা সযত্নে মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে দিতো। তার ওপরে সাঁটা থাকতো আমাদের নাম, ক্লাস, সেকশন, স্কুল এর নাম এর লেবেল। বাবার নিজের হাতে লেখা। প্রথমে ট্রেসিং পেপারে হাতে লেখা। তার পর ড্রইং এর কপি করার যন্ত্রে অ্যামোনিয়া প্রিন্ট করা। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এর ডিজাইন বিভাগে কাজ করতো বলে, এ সব আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ছাপার মতো সেই সব নাম এর লেবেল সহপাঠীরা ঈর্ষার সঙ্গে তাকিয়ে দেখতো। আমরা চাপা গর্ব অনুভব করতাম।

বাবার হাতের লেখার সুনামের পরিচিতি ছিল বন্ধু, আত্মীয়, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। একদিন বাবার বন্ধু মঞ্জুদা একটা সাইন বোর্ড লেখার অনুরোধ নিয়ে এলো। মঞ্জুদা বাবার থেকে কয়েক বছরের ছোট। বাবাকে দাদা বলে ডাকে। মঞ্জু কি করে ছেলের নাম হয় জানতাম না। হয়তো মঞ্জুনাথ বা ঐ ধরণের কোনো নাম ছিল ওনার! আমরা পুরোটা জানতাম না।সকলে মঞ্জুদা বলেই ডাকতো। উনি একটা ফটোগ্রাফি স্টুডিও খুলছেন, ছবি তোলা , প্রিন্টিং এর কাজ হবে। বাবার তো সাইন বোর্ড লেখার অভিজ্ঞতা নেই, তাই রাজি হচ্ছিলো না। মঞ্জুদা নাছোড়বান্দা। বাবা কে লিখতেই হলো। ইয়াব্বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো টিনের সাইনবোর্ড এলো। তার ওপর হালকা

সেকাল একাল

গাইডলাইন টেনে মুক্তাক্ষরে বাবা লিখলেন "সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও"। দুপাশে দুটি ফুলের মোটিফ। বাস স্ট্যান্ড আর বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবার সময় গর্ব ভোরে সেই সাইন বোর্ড এর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বাবার নিজের হাতে লেখা। ব্যস্ত বাজারের মাঝে অনেক দোকানের অনেক অনেক সাইনবোর্ড এর মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান। বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়দের বিকেলে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতাম। বহুদিন অবধি সেই সাইনবোর্ড মঞ্জুদার দোকানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

কত যুগ কেটে গেছে। বাবা এখন টলমল করে হাঁটে, চেনা মানুষদের নাম মনে করতে না পেরে, আমার সৌখিন বাবা ঘোলাটে চোখে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সেদিন বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়লো সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও। ডেস্কে এখনো বসে মঞ্জুদা। বুড়ো হয়েছেন, আরো রোগা হয়েছেন। আশির ওপরে বয়স। তবুও সক্ষম একজন মানুষ। এখনো স্টুডিওতে বসছেন। বাবার সমসাময়িক বেশির ভাগ মানুষই গত হয়েছেন। মঞ্জুদাকে দেখে ভালো লাগলো। একটা যুগের শেষ কয়েকজন প্রতিনিধির একজন। সাইন বোর্ড বদল হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। এখন আর কেউ হাতে সাইনবোর্ড লেখে না। ফ্লেক্স এসেছে, কম্পিউটারে গ্রাফিক্স টেক্সট এ সব কম্পোস করা হয়, স্ক্রিন প্রিন্টিং করা হয়।

সেকাল একাল

মঞ্জুদার দোকানেও নতুন যুগের নতুন সাইন বোর্ড বাবার লেখা সাইন বোর্ড এর জায়গা নিয়েছে। যাক তাতে দুঃখ নেই। মঞ্জুদাকে দেখে ভালো লাগে। সুস্থ আছেন, এর থেকে বেশি আর কি বা চাওয়ার থাকতে পারে!

ফেরার পথে বাস স্ট্যান্ড এর পাশে বাজারের ভিতরটা ঘুরে আসি। বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ছাউনি ঢাকা মেইন অংশে বড় মাপের সবজি আলু পটল পেঁয়াজ এর ব্যবসায়ীরা বসে। এক ধারে মাছের বাজার। বড়ো মাছওয়ালা উঁচু বেদির ওপরে বসে, ছোট মাছওয়ালা মাটিতে বসে।সব দেশে, সমাজের সব বিভাগেই ক্লাস ডিফারেন্স, জাতপাত, মেইন স্ট্রিম-মার্জিনাল স্ট্রিম, উচ্চঘর কংস রাজার বংশধর আর চাঁড়াল, হাই ক্লাস আর সাবঅল্টার্ন এই সব শ্রেণী বিভাগ আছে। বাজার তার ব্যতিক্রম নয়। মেইন বাজার ছেড়ে তাই পেছনের গলি দিয়ে বেরুনোর রাস্তার দিকে এগিয়ে যাই। বড় বাজারীরা এখানে নেই। দূর থেকে আসা বুড়ি কয়েকজন দু একটা জিনিস নিয়ে বসে। মূল বাজারে বসার অধিকার বা সঙ্গতি কোনোটাই এদের নেই। এক জন বিধবা বুড়ি মানুষ এর সামনে রাখা কিছু ডুমুর, কয়েকটা দিশি কচু, আমড়া, কামরাঙ্গা, বকফুল। অনেক দিন পরে জিনিসগুলো দেখলাম। আমার চেহারা বাজার করতে আসা লোকের মতো নয়। আমার জিন্সের ওপরে টি শার্টের রং আর সবার থেকে আলাদা। আমার পায়ে কিন (Keen)

এর জুতো আর কারো সাথে মেলে না। দোকানিরা বেশির ভাগ তাই আমার কি চাই জিজ্ঞেস করতে আগ্রহ বোধ করে নি। বুড়ি কিন্তু প্রশ্ন করে - "কি খুঁজছো গো, কি নাগবে?" হয়তো শিষ্টাচার অথবা সত্যি সত্যি সাহায্য করতে চায়। দুটো শাকের মধ্যে কলমি শাক চিনতে পেরেছি। অন্যটা চেনা চেনা লাগছে কিন্তু নাম মনে নেই। জিজ্ঞাসা করতে বলে "হিঞ্চে।" সব কিছু চুটিয়ে কিনতে ইচ্ছে করছে। বাজারের ব্যাগ ভোরে এই ডুমুর, কচু, আমড়া, কামরাঙ্গা, বকফুল, হিঞ্চে সব কিছু। মনে মনে বুড়ি কে বলি, কিন্তু এ সব রান্না করবে আমার চেনা এমন লোক তো আর একজনও বেঁচে নেই যে। তা ছাড়া বাড়িতে ভাইপো ভাইঝিরা আসা করে বসে আছে আমি তাদের জন্য পিৎজা, পাস্তা, নুডলস, পেস্ট্রি, বা বিরিয়ানি কিনে বাড়ি ফিরবো। ডুমুর বা হিঞ্চে শাক দেখলে তারা আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। আমার পায়ে কিন (Keen) এর জুতো। বুড়ির কাছ থেকে বকফুল বা কামরাঙ্গা কেনার উপায় আর আমার নেই। তবু ভালো লাগে দেখে এখনো কেউ কেউ এসব জিনিস নিয়ে বসে সেইখানটায় - যেখানে বাজার শেষ হয়ে গিয়ে বাইরে বেরোনোর গলি শুরু হয়েছে। এখনো কেউ কেউ সে সব কেনে দূর গ্রাম থেকে আসা এই সব বুড়িদের থেকে। আর মঞ্জুদারা, এই বয়সেও, এই ডিজিটাল যুগেও ফোটো তোলার খদ্দেরের আসায় রোজ সিদ্ধেশ্বরী স্টুডিও তে এসে বসে। নাই বা রইলো সেই দোকানে আমার বাবার লেখা প্রথম সাইন বোর্ড। ■

সনেট ২০১৮

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

সমস্ত সময়ই যেন আনে,
পূবালী হাওয়ায় অবিশ্বাসের সুর...
শুধু অপূর্ণতার ঢেউই জানে
কত সুন্দর ঐ পশ্চিমি ঝুমুর!

অদৃশ্য নগরের শিশুতীর্থ...
কার্বনে ভরেছে মনের দেয়াল।
মানুষ কি ভুলেছে বাঁচার অর্থ!
তাই কানে ভাসে শেয়ালের খেয়াল।

কারো কাছে নেই অযথা সময়,
শুধু তারারা মুখ টিপে হাসে।
ভাবার ক্ষণটি কই? জীবন কর্মময়,
অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের আশে পাশে।

কার খোঁজে, কার ভোজে এ সম্মোহন!
যায় না ফেরা, ছিঁড়ে মোহের রমণ? ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

বাঁধ

অনির্বাণ বিশ্বাস

"যেও না এখন। কথা শোনো আমার। দেখছো তো আকাশের কি অবস্থা! এই অবস্থায় কি বাইরে যেতে আছে?" - মৌরী তার স্বামীকে বাইরে বেরোতে বারবার বারণ করছিলো। কিন্তু ছেলের খাতা-বই কিনতে সুনীল একেবারে মরিয়া।

সুনীল - "আরে, এ বৃষ্টি আজ পাঁচ দিন ধরে হচ্ছে। কবে থামবে বলো? তার জন্য আমার ছেলেটা বই না পড়ে বসে থাকবে বলো? এমনিই তো এতদিন ওকে বই কিনে দিতে পারিনি। আজ কটা টাকা পেয়েছি, আর না, আমি আমার ছেলেকে আমাদের মতো মূর্খ হয়ে থাকতে দেবো না। এই তো যেতে আধঘন্টা মাত্র লাগবে সাইকেলে।"

"লক্ষ্মীটি একটু আমার কথা শোনো। এখন ঐ বাঁধের পাশ দিয়ে যাওয়া মোটেও নিরাপদ নয়। নদী ফুঁসছে। কালকেও একদিক ভেঙে গিয়ে জল ঢুকছিলো। কোনোরকমে সারিয়েছে বুঝলে!" -মৌরী চিন্তান্বিত হয়ে বললো। কিন্তু সুনীল তাকে পাত্তা না দিয়ে বললো - "তোমরা মেয়েরা তিলকে তাল করতে পারো। ছাড়ো তো, আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো।" - বলে সে মাথায় একটা প্লাস্টিক জড়িয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

কর্তব্য

"দুগ্গা, দুগ্গা, হে ঠাকুর রক্ষা কোরো!" - বলে মৌরী মাথায় হাত দিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করলো। সে চিন্তান্বিত অবস্থায় ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু ধমকে বললো - "পড়ো ভালো করে পড়ো। ধন্যি তোদের নেকাপড়া। এখন কি হবে কে জানে?"

ওদের ছেলে খুবই পড়াশোনায় ভালো। এতো অভাবের মধ্যেও শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। তবে গাঁয়ের স্কুলের সব মাস্টারমশাইরা তাকে খুবই সাহায্য করেন। সবাই তাদের পুরো পরিবারকেই তাদের ভদ্র ব্যবহারের জন্য ভালোবাসে।

"বৃষ্টিটা আবার বাড়লো রে খোকন! নদীর জলের আওয়াজ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। বাঁধটা যেন না ভাঙে। এমনিই তো সারা গ্রাম জলে ভর্তি। এর উপর যদি বাঁধটা ভাঙে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে রে! হে ঠাকুর তুমি রক্ষা করো!" - মৌরী ভয়ার্ত মুখে বললো। ছোট ছেলেটার পড়তে পড়তে মায়ের কথা শুনে চিন্তায় মুখটা শুকিয়ে গেলো। ছোট মানুষ সে, ভয় পেয়ে মার কোলে গিয়ে সিঁধোলো।

হালকা একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তারা শুনলো। "ওটা কিসের আওয়াজ? তোর বাবা এর মধ্যে নেই, কি যে করবো!" - তার ভয়েতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো। হঠাৎ কোনো বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠলো। সেই সঙ্গে অনেক লোকের কোলাহল। সে একটু বাড়ির দরজায় মুখ বাড়িয়ে পাশের বাড়ির মালাকে ডেকে বললো - "কি হল রে?"

সে বলে উঠলো -" বলতে পারতিছি না গো! বাঁধের যেন কিছু না হয় গো।আমার সোয়ামী দেখতে গেছে। এলে জানাবো।"

মৌরী - "আমার সোয়ামী তো আবার পুবের পাড়ার দিকে ছেলের বই নিতে গেলো। কলিকাতা থেকে আমার ছেলের বইগুলো আনার কথা সৌমেনদার। পয়সা ছিলো না বলে লজ্জায় আনতে যেতে পারিনি। তাই..."

"বলো কি গো? ঐদিকে তো বাঁধের ধার দিয়ে যেতে হয়। এখন কেন যেতে দিলে দাদাকে?" - মালার কথায় আতঙ্ক লুকিয়ে ছিলো।

"আমার কথা কি শুনেছে কখনো? এখুনি আসবে বলে সেই যে গেলো আর এলোনা। কি যে... " - তার গলা বুজে এলো।

"চিন্তা কোরো না গো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ তো ও আসছে মনে হচ্ছে।" - মালা বলে উঠলো।

ওরা দেখলো কয়েকজন দৌড়ে আসছে। যে যার ঘরে ঢুকে গেলো। আর মালার স্বামী এসে জানালো বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ, তাই আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গিয়ে বাঁধের কাজ করতে হবে না হলে বাঁধ কিছুতেই বাঁচানো যাবেনা। মালা আঁতকে উঠলো। সে স্বামীকে বারণ করলো।

"আমাদের গ্রাম, আমাদেরই তো রক্ষা করতে হবে। তাই সবাই মিলে আমাদের বাঁধকে রক্ষা করতে হবে। কাল

সকালের আগে কোনো সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাই আজকের রাতটা যদি কোনোরকমে পার করা যায়, তাহলে হয়তো অনেক ক্ষতি আটকানো যাবে। দেখি কি করতে পারি। চলি মালা, সাবধানে থেকো। চল হারান।" - এই বলে পাশের বাড়ির হারানকে ডাক দিয়ে, সে দূরে মিলিয়ে গেলো।

রাত ক্রমশ বাড়তে লাগলো। তার সঙ্গে বাড়তে লাগলো বৃষ্টি। গুম গুম করে বাঁধের গায়ে জল ধাক্কা মারার শব্দ আসছিল। অনেক মানুষের গলার আওয়াজও মাঝেমাঝে পাওয়া যাচ্ছিলো। জল ক্রমশ ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ছিলো। মায়ে ছেলে মিলে, চৌকির পায়াগুলোর নীচে ইঁট দিয়ে উঁচু করে দিলো। ঘরের মধ্যে অন্য ভিজে যাবার মতো জিনিসগুলো তারা চৌকির উপর তুলে নিলো। তার স্বামী না আসায় সে ছেলেকে মুড়ি আর নাড়ু খেতে দিলো। ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে কখন যে মায়ে-পোয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো কে জানে?"

হঠাৎ বাইরে অনেকের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখে সৌমেনদা এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সে বললো - "আরে কালকে অনেক রাত্রে সুনীলদা এসে টাকা দিয়ে বললো যে সকালে বইগুলো একটু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতে। অনেকদূর যাবে নাকি। আমি বললাম নিয়ে যেতে। কিন্তু মাথা নেড়ে বললো বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। তাছাড়া তাকে অনেকদূরে কোথাও যেতেই হবে ,সময় নেই। এই নাও বৌদি তোমাদের ছেলের বই-খাতা।"

কর্তব্য

মৌরী বললো - "এখন যা অবস্থা তোমাকে যে ঘরে বসতে দেবো, তার যো নেই। এসো সময় করে একদিন। তোমার দাদা তো কাল রাত থেকে আর ফেরেনি।"

"সে কি, কোথাও যায়নি তো?" - সৌমেন চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

মৌরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। সৌমেন কাজ আছে বলে চলে গেল। দূরে অনেক লোককে এদিকে আসতে দেখে সে দৌড়ে একটু এগিয়ে গেলো। পাশের বাড়ির মালাও সব শুনতে পেয়ে তার সঙ্গে গেলো। মৌরীর মনের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছিলো। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

তাদের সামনে এসে মুখোমুখি সবাই থেমে গেলো। মালা দৌড়ে তার স্বামীর কাছে গিয়ে বলল - "দাদার কি হলো বলো? চুপ করে থেকো না। দাদা কোথায় বলো?"

সে বললো - "দাদা ছেলের বই আনতে গিয়ে, আমাদের বাঁধের অবস্থা খারাপ দেখে একাই প্রায় অনেকক্ষণ সামাল দেবার চেষ্টা করেছিলো। তখনো সবাই আসেনি। কিন্তু একটা দিক হঠাৎ ভেঙে পড়ায় হড়কে পড়ে যায়। আর নদীর জলের তোড় নিমেষে দাদাকে... " - বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। বউদি আমাদের চোখের সামনে যেন দাদাকে এই রাক্ষস নদী গ্রাস করলো। আমরা কিছুই করতে... দাদা নিজেকে বলিদান দিয়ে সারা গ্রামকে বাঁচিয়ে

গেলো।" - বলে আবার কাঁদতে লাগলো। গ্রামের মোড়লমশাইও বললো - "তোমার স্বামীর অবদান আমরা সারাজীবন মনে রাখবো।" - তাঁরও চোখ জলে ভরে উঠলো। মালা বলে উঠলো - "দিদি, আমি যে শুনলাম দাদা সৌমেনদার কাছে টাকা দিয়ে এসেছে, অনেক রাত্রে! কখন গেলো তাহলে?"

সবাই শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। মৌরী আস্তে করে বললো - "যাবার আগে বাবার কর্তব্যটুকু ও করে গেলো।" - বলতে বলতে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। ■

প্রকাশ করুন আপনার নিজস্ব ই-বুক

আপনি কি লেখক?
আপনি কি দেশে বিদেশে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে চান?
আপনি কি নিজের ই-বুক বানাতে চান?
আপনি কি আপনার ওয়েবসাইটে ফ্লিপ বুক রাখতে চান?

'পাণ্ডুলিপি' এ ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সেলফোনঃ +৯১ ৯২৮৪০ ৭৬৫৯০
ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

কথা দিলাম তোমাদের আমি

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

আমাকে একটু সময় দাও –
আমি জুড়ে নিতে চাই কলমি আর দুলালের
ভেঙে যাওয়া সংসার।
আমাকে একটু সময় দাও –
আমি সাহসের হাপরে আগুন-মন গড়ে দিতে
চাই ধর্ষিতা শিশু তানিশার।
আমাকে একটু সময় দাও –
কপট প্রেমিকের লালসার হোলিতে বাস হলো বানিশান্তায়
যে কিশোরী কমলার, তার হাতে
এক বাক্স জ্বলন্ত দেশলাই তুলে দিতে চাই।
আমাকে একটু সময় দাও –
আজন্ম বেকার নেশাখোর চল্লিশোর্ধ্ব সূর্যকান্ত,
যে সর্বস্ব খুইয়ে আর বাড়ি ফিরলো না,
তার হাতে একটি রক্তগোলাপের চারা তুলে দিতে চাই।
আমাকে একটু সময় দাও –
আমি ঈভের আমল থেকে শকুন আমলে ঘটে যাওয়া সকল
গুম, খুন আর ধর্ষণের সঠিক হিসেব দেবতার পরিসংখ্যান
দফতরে জমা রেখে যেতে চাই।

আবেদন

আমাকে একটু সময় দাও –
যে নাবালক জন্মের পর আস্তাকুঁড়ের বিছানা পেলো,
তার রক্তে আমি ভিসুভিয়াস এর আগুন-কণা
বুনে দিতে চাই।
আমাকে একটু সময় দাও –
সকল তন্ত্রের বদ মন্ত্রগুলোকে বদলে নিয়ে
এ পৃথিবীর ছায়াপথে একটিমাত্র মন্ত্র সনদ জারি করতে
চাই।
আমাকে একটু সময় দাও –
মরে যাবার আগে এ পৃথিবীটাকে আমি
চিল আর শকুন মুক্ত করে যেতে চাই।

আমাকে তোমরা আর একটু সময় দাও –
মুমূর্ষু গাছেদেরও আমি ফেরাবো সজীব শ্বাস
ফেরারি পাখিদেরও দেবো ফিরায়ে তাদের ফেলে যাওয়া
আবাস।

কথা দিলাম তোমাদের আমি,
আমার অন্তিম যাত্রাকালের আগে
দেবতার হাতে জমা রেখে যাবো এক
অমর অক্ষয় চাবি, "শান্তির নিবাস"... ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

ভ্রমণ কাহিনী

ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল

(জয়শলমীর পর্ব, প্রথম অধ্যায়)

মালা মুখার্জী

অনেক সময় নিয়ে যোধপুর দেখলেও মাথায় খেয়াল রাখতে হচ্ছিল যে পরের দিন সোমবার ভোর সাড়ে ছটায় বাস, আর আমি বাস স্ট্যাণ্ডটাই চিনি না। আমাদের গাড়ীওয়ালা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিল যে বাস ফেল হলেও ও গাড়ীতে পৌঁছে দেবে মাত্র ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে, তাছাড়া সরকারী বাস আমাদের উপযুক্ত নয় নাকি। কিন্তু আমি ওই দু'শ টাকার টিকিটেই অনড়। ভাগ্য ভালো ছিল রাতের দিকে হোটেলের ওয়াই ফাই টা কাজ করতে শুরু করলো। যাক বাবা, সরকারি বাসের স্ট্যাণ্ডটা খুব দূরে নয়। এখানে বলে রাখি, রাজস্থান রোডওয়েজের বাস খুবই নিরাপদ ও আরামপ্রদ, এর টিকিট অনলাইন এও কাটা যায়। ভলভো এবং ডিলাক্স বাসের অপশনও আছে। সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে কাটলে সিনিয়র সিটিজেন, স্টুডেন্টস, ও লেডিস কনশেসন মেলে, রেডবাসের অ্যাপস থেকে কাটলে তা হয় না।

এরই মাঝে জয়শলমীরের হোটেল মূমাল থেকে দুবার কল এসেছে। আমাদের আসার টাইম ইত্যাদি জেনে স্ট্যাণ্ডে গাড়ী পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে। এটা নাকি ওদের কমপ্লিমেন্টারি সার্ভিস। কেন কমপ্লিমেন্টারি সেটা পরে বুঝেছিলাম অবশ্য।

যোধপুরে কুয়াশা না থাকলেও পশ্চিমের শহরে সূর্যোদয় হতে বেশ দেরী হয়। তাই যখন বাস তার যাত্রা শুরু করলো তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। এটা সাধারণ এক্সপ্রেস বাস, ভলভো নয়, তাই ক্রমশ বাসে নিত্যযাত্রীদের ভীড় বাড়তে থাকে। নিত্যযাত্রীদের মধ্যে স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে সবজিওয়ালা ও ফৌজি সবাই আছে। ক্রমশ মারওয়াড় হার্টল্যাণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে মেবারে প্রবেশ করলাম। এই দুই অঞ্চলের পোশাক-আশাক, রীতি নীতি সব আলাদা। একগলা ঘুঙট টানা, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি আর প্রচুর গয়নাপরা ছোট-বড় সব বয়সের বৌ, তাদের বিশাল রঙচঙে পাগড়ী আর সোনার দুল পরা ‘বিঁদ’ বা বরেদের দেখে কালার্সের (টিভি চ্যানেল) বালিকা বধূর (টিভি সিরিয়াল) সেটে বসে আছি মনে হল।

অবশেষে বাস পোখরানে পৌঁছে একটা বড় হল্ট দিল। সত্যজিত রায় যখন সোনার কেল্লা লিখেছিলেন, তখন পোখরান নিউক্লিয়ার টেস্টের জন্য বিখ্যাত হয়নি, তবে এখন এ জায়গার নাম শুনলে ওটাই আগে মনে হয়।

পোখরান এমনিতে খুব ছোট শহর, তবে জয়শলমীরের পর এটাই গুরুত্বপূর্ণ জনপদ যেখানে হাসপাতাল থেকে স্কুল কলেজ সব আছে। খুব খিদে পেয়েছিল, তাই দুটো বোম্ব মানে ফুলুরি কিনলাম। লঙ্কায় ঠাসা ফুলুরিতে কামড় দিতেই বুঝলাম কেন একে বোম্ব বলে, দৈত্যাকর জিলাবি খেয়ে ঝাল কমালাম।

নীচে নেমে খাবার আর জল কিনে বাসে উঠতেই দালালরা ছেঁকে ধরলো। এখনও যখন বাসে বসে আছি তার মানে স্বর্ণশহরই আমাদের গন্তব্য। তাই সাইটসিন থেকে হোটেল সব কিছুর দায়িত্ব নিতে চায় তারা। সরকারি হোটেল ভাল নয়, ইত্যাদিও শুনলাম। তবে হোটেলে বুকিং আছে শুনে মুষড়ে পড়লো একটু। কেউ কেউ হোটেলে যাওয়ার গাড়ীও করে দেবে বলল। সেটাও নিতে আসবে জেনে লোকগুলো নেমে গেল। অবশ্য এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, জয়শলমীরের ইকনমি ট্যুরিজিমেই চলে। এদের হাত এড়াতেই বুঝি কমপ্লিমেন্টারি পিক আপ-ড্রপের ব্যবস্থা!

বাস পোখরান ছাড়ল। দু'পাশে ঊষর প্রান্তর, কাঁটা ঝোপঝাড়, বালি আর কিছু উট ছাড়া দেখার কিছু নেই। জানলা দিয়ে রোদ আসছে খুব, সঙ্গে হাওয়াও। দিল্লীতে যখন তিন চার ডিগ্রী, এখানে তখন বেশ গরম। তবে শীতকাল তো, তাই মনে হচ্ছে এসি গাড়ীর জানলা দিয়ে যেন রোদ আসছে। বাস জয়শলমীরের আরও কাছাকাছি এলে গরম জামা কাপড় খুলতে হল।

এক জায়গায় রাস্তা দুধারে বাইফার্কেট হয়ে গেছে। এক ফালি রাস্তা বারমেঢ়ে, আর এক ফালি যাচ্ছে জয়শলমীরে। জয়শলমীরের পথে ভীড় আছে, বারমেঢ়ও মরুশহর হলেও বাঙ্গালী পর্যটকরা কেউ অত যায় না, বোধহয় ফেলুদার চরণ পড়েনি বলেই!

শেষকালে যখন ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়ম পার হলো, বুঝলাম আমরা জয়শলমীরের প্রায় কাছে। সবুজ গ্লোসাইন 'ভারত কি স্বর্ণ নগরী মে আপকা স্বাগত হ্যায়' দেখার পর আর গুগল ম্যাপে আমাদের অবস্থান দেখে বুঝলাম আমাদের গন্তব্য এসে গেছে। বাস টার্মিনাসের দিকে বেঁকতেই এক ঝলকে দেখলাম সোনালী বেলেপাথরে নির্মিত সোনার কেল্লা বা জয়শলমীর ফোর্ট, সোনালী সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে। আমাদের সাড়ে পাঁচ ঘন্টার বাস জার্নির পরিসমাপ্তি ঘটল। একদম সঠিক সময়, সাড়ে বারোটায় বাস ঢুকেছে ।

আর টি ডি সি কথা রেখেছিল। আমাদের জন্য এসি ক্যাব পাঠিয়েছিল। গাড়ীর ড্রাইভার অত্যন্ত আপ্যায়ন করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলল হোটেল মূমালে। এই হোটেল সরকারী হলেও এর নামটি জয়শলমীরের লোকগাথার সঙ্গে যুক্ত। রাজকুমারী মূমাল অমরকোটের রাজকুমার মহেন্দ্রকে ভালবাসতেন, কিন্তু মূমাল মায়ারাজ্যের যাদুকরণী হওয়ার সুবাদে তাঁদের প্রেম স্বীকৃতি পায় না। অসমাপ্ত প্রেম পূর্ণতা পায় সহমরণে। সিন্ধুদেশের এই লোকগাথা শাহ আব্দুল লতিফ বিথ্থাইয়ের লেখনীতে অমরত্ব লাভ

করে কখন জনমানসে পাকাপাকি স্থান করে নিয়েছে তার হিসাব বুঝি ইতিহাসও রাখে না। হোটেলের স্থাপত্যও পুরোনো হাভেলীর মতোই। নর্মাল ঘর ছাড়াও টেন্টে থাকার ব্যবস্থা আছে।

আধার কার্ড দেখানো মাত্রই একটি গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ঘর দেওয়া হল। এটা অবশ্য আমার ষাটোর্ধ্ব মায়ের খাতিরেই, নইলে ওপরের ঘরই সবাই পাচ্ছিল। মূমালের রুম প্রাইস তেরশ করে পার নাইট, মহিলা আর সিনিয়র সিটিজেনদের অবশ্য কনসেশন আছে। আমরা শুধু মহিলারা যাওয়ায় ২৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট পাওয়া গেল। এসব প্রাইসচার্ট অবশ্য সিজনালি চেঞ্জ হয়, তবে ডিসকাউন্ট পেতে গেলে আর টি ডি সির ওয়েবসাইট দিয়ে বুক করা বাঞ্ছনীয়।

লাঞ্চের পর পরই সাইট সিন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করতে মহেন্দ্র সিং চলে এলেন। ইনিই এই হোটেলের সাইটসিন করান। দু'রকম প্যাকেজের অফার দিলেন, একটা উইথ টানোত মাতা পাঁচ হাজার, উইদাউট টানোত মাতা তিন হাজার। আমি প্রথমটাই নিলাম, খরচ একটু বেশী হলেও এত কাছে এসে ভারত-পাক সীমান্ত লঙেওয়ালা দেখবো না, এ তো হতেই পারে না। টানোত মাতা হলেন মরুতীর্থ হিংলাজেরই ভারতীয় সংস্করণ। ১৯৭১ সালে লঙেওয়ালা যুদ্ধের সময় মাতার মহিমা দেখা যায়, মন্দির চত্বরে পড়া সব শেলই অকেজো হয়ে মন্দিরটি অদ্ভূতভাবে রক্ষা পায়। বর্ডার ছবি দেখার পর এই জায়গায় যাওয়ার কৌতুহল ছিল, তাই দরাদরি করলাম না। ...ক্রমশ ■

দিবাস্বপ্ন

প্রণব কুমার বসু

জুতোগুলো পরি যদি
ঠিক করে মাথাতে
টুপিটাকে রাখব যে
মাপ মতো ভুঁড়িতে -

জামাটার কাঁধে যদি
লেগে থাকে ছাতাটা
রোদ্দুর বৃষ্টি ঝড়ে
ভিজবেনা মাথাটা -

প্যান্টগুলো যদি ঠিক
ছোট বড় করা যায়
পার্টি বা অফিসেতে
পড়বোনা দোটানায়-

নখ যদি বড় হয়ে
আগে আগে চলতো
কুকুরকে ভয় পাওয়া
একদম কমতো –

চুলগুলো বড় হয়ে
যদি ওঠে ওপরে
গাছ থেকে ফল খাওয়া
আনন্দ আহারে -

হাতটা বাড়িয়ে যদি
সবকিছু পেয়ে যাই
একশো তে একশত
পাল্টাবে জীবনটাই।■

একমাত্র গুঞ্জনই আপনার লেখা পৌঁছে দিতে পারে সারা বিশ্বের বাঙালি পাঠকদের কাছে।

যোগাযোগঃ contactpandulipi@gmail.com

লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে, 'পাণ্ডুলিপি'র বিচারক মণ্ডলির সিধান্তই চুড়ান্ত।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৫)

রঞ্জনা ঠিক আগের মতো নিরুত্তর হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। সুধীরবাবু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে ছাতাটা নিয়ে বাইরে বেরোতে যাবেন; ঠিক সেই সময় তাঁর কানে এলো রঞ্জনার অস্পষ্ট ডাক...

— মামা, ওই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে ও যেন কি রকম বদলে যায়। যে কোনদিন ছবি আঁকে নি, সে ছবি আঁকে। আমাকে একদম সহ্য করতে পারেনা। কি ছবি আঁকে তাও দেখায় না। ঘর অন্ধকার করে রাখে সারাক্ষণ। আর পঙ্গু মানুষটা রাতে আমার ঘরে তালা দিয়ে কীভাবে হেঁটে হেঁটে বাইরে যায় তা আমি জানি না। আবার সকালে না থাকে আমার ঘরে তালা, না থাকে তার পায়ে জোর।

— কি সব বলছিস? জয় কি তাহলে হাঁটতে পারে? ইচ্ছা করে...

— না ও সত্যি হাঁটতে পারেনা। কিন্তু

— কিন্তু কি?

— ও রাতে অন্য মানুষ। সেদিনের সেই দুর্ঘটনাটার পর থেকেই জয় কি রকম পাল্টে যায়। প্রথম দিকে আমি

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ভেবেছিলাম হয়তো ওর একটা পা অসাড় হয়ে যাওয়ার কষ্টটা এবং চিরদিনের মতো ফুটবল খেলতে না পারার মানসিক যন্ত্রণাটা ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। তাই হয়তো আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছে, আমার সাথে একসাথে একঘরে থাকেও না। কিন্তু একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় একটা শব্দে। কে যেন সদর দরজাটা সজোরে খুলে গটগট করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। আমি ঝটপট উঠে ঘরের দরজাটা খুলতে যাই। কিন্তু দরজাটা কে জানো বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে তার আগেই। রাতে ভোলাদাও বাড়ি চলে যেত। তাই আমি ডাকলেই বা কে খুলবে দরজা? তাই ছুটে গেলাম রাস্তার দিকের জানলাটার কাছে। গিয়ে যা দেখলাম , তা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনি। জয় একটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে হনহন করে মোড়ের মাথার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কতবার ডাকলাম, কিন্তু না দিল সাড়া, না একবারও ঘুরে তাকাল। আমি সারা রাত দু’ চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। জানলার কাছে এক ভাবে বসে রইলাম। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে দেখলাম আমার ঘর ভর্তি আলো আর দরজাটা খোলা। আমি ছুটে যাই ওর ঘরে দেখি ও ঘরে ঘুমাচ্ছে। দুপুরে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, কিন্তু ডাক্তার বলল ওর পা কোন দিনও ঠিক হতে পারবেনা। পায়ের সব শিরাগুলো ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে। ওর পক্ষে আবার কোনদিন হাঁটতে পারা সম্ভব নয়।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

এরপর সেই রাতের কথা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওর অসহায়তাকে নিয়ে আমি পরিহাস করছি। কিন্তু সেদিনের রাতটা বারাবার ফিরে আসে, কখনও আমি তা টের পাই, কখনও পাইনা। পরশু আমি ওর ঘরে তালা দিয়ে দিই যাতে ও বেরোতে না পারে। কিন্তু...

এতক্ষণ সুধীরবাবু মন দিয়ে সব শুনছিলেন, তিনি এবার বললেন — কিন্তু কি?

— মাঝরাতে দেখি তালা খোলা, জয় ঘরে নেই। তারপর আজ সকালেও আমার ওপর এতোটাই রেগে যায়, যে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে ওর কোন কুণ্ঠা বোধ হল না। এই বলে রঞ্জনা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। ...ক্রমশ ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

অসুখ

সরজিৎ মণ্ডল

নদীর পাড়ে আলগা গায়ে তোমার সাথে হঠাৎই
দেখা হয়ে যায় ।
তুমি বালি নিয়ে খেলছিলে ছোট্ট বন্ধুদের সাথে,
হঠাৎ আমার আবির্ভাব তোমাকে কেমন যেন
একটা সলজ্জতায় চেপে ধরেছিল সেই বালির সাথে।
আর আমি মোহিত হয়ে তোমার সেই রূপে
ডুবে যাচ্ছিলাম !

তারপর..., বহুবার সেই নদীর জলকে
জিজ্ঞেস করেছি তোমার হদিস, বলেছি নদী আমি যে
তোমার সেই মেয়েটিকে...; নদী আমার কোন কথা
না শুনেই কেবল বয়ে যাওয়া দেখিয়েছে...

দশ বছর বয়ে গেছে।

তুমি আজ শহরের বিখ্যাত ডাক্তার।
আর একবার তোমার দেখা পাব বলে
দুশো টাকা জমা দিয়ে এসেছি তোমার চেম্বারে।
আমার অসুখ কি সারাতে পারবে, ডাক্তার? ■

আপনার পরিচিত পাঠকদের মধ্যে 'গুঞ্জন' শেয়ার করুন

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(২)

এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি খন্ড পরিক্রমা করছি। এর ধরন হলো – নর্মদার যে কোনো ঘাট থেকে মায়ের পূজো করে জল নিয়ে পরিক্রমা শুরু করা যায়। যে তট ধরে শুরু হলো সেই তট ধরেই সাগর পেরিয়ে অন্য তটে যেতে হবে এবং পুনরায় শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে হবে। তারপর ঐ নর্মদার জলকে ওঁকারেশ্বরের শিবের মাথায় ঢেলে দিলে পরিক্রমার উজ্জাপন হলো। জল ওঁকারেশ্বরের মাথায় না ঢালা পর্যন্ত পরিক্রমা উজ্জাপন হবে না। সব ধরনের পরিক্রমার ক্ষেত্রে এটা বাধ্যতা মুলক। এখন গাড়ীতে পরিক্রমা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। গাড়ীতে ১৬-১৮ দিনেই শেষ হয়ে যায়। আর একটি পরিক্রমা হলো পঞ্চকোশী পরিক্রমা। অমরকণ্টকের কিছু জায়গা চার রাত ও পাঁচ দিনে ঘুরে আবার অমরকন্টক ফিরে আসতে হয়। শেষে পরিক্রমা উজ্জাপন করতে হয় অমরকন্টকেই। এটি সব থেকে সহজ বলে মনে হয়। তবে ওঁকার পর্বতটি ৫ থেকে সাড়ে ৫ ঘন্টার পরিক্রমাও পঞ্চকোশী পরিক্রমার-ই সমতুল্য। সব থেকে কঠিন জলহরি পরিক্রমা। ৩ বছর ৩ মাস ১৩ দিন লাগে। এর বেশীও লাগতে পারে। কোনো পরিক্রমাতে কোনো ভাবেই নর্মদা অতিক্রম করা যাবে না। অতিক্রম করলেই পরিক্রমা খন্ডন হয়ে যাবে।

এই দিকটা ভাল করে লক্ষ রাখতে হয়। আর একটা কথা আমি উপলব্ধি করেছি – আমার নজর মায়ের দিকে না থাকলেও, মা তাঁর অধম সন্তানের দিকে সব সময় স্নেহের নজর রাখেন। পরিক্রমা সংকল্প করার সাথে সাথে মা তাঁর সন্তানের উপর নজরদারি শুরু করে দেন।

আজ ১/১১/২০১৫ তারিখ রবিবার। কোন রাস্তা নেই। নদীর পাড়, পাহাড়ের কিনারা ধরে এগিয়ে চলেছি। থামার উপায় নেই তাই এগিয়ে চলা। বলতে ইচ্ছা করছে, "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।" যখন পাথরের ধাক্কা খেয়ে গাছের ডালের উপর আছাড় খেয়ে বাস্তবের সামনে পড়ছি, তখন আর আনন্দ থাকছে না। যন্ত্রনায় পরিনত হচ্ছে। কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব। চলেছি... চলছি... চলব... একটা রাস্তা পেলাম। চড়াই-উৎড়াই শেষ। কম করে ১১ কিলোমিটার হাঁটার পর দুপুর ১২ টার সময় রাস্তার পাশে একটা দোকানে এলাম। এই গ্রামটার নাম শুনলাম খন্না। আবার যাত্রা শুরু... ১২টা ১৫ মিনিটে হাঁটা শুরু করে সোজা রাস্তা ধরে, দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে নর্মদার পাড়ে পাহাড়ের উপরে একটা কুঠির পেলাম। জায়গাটার নাম রামঘাট। এখানকার মহারাজ জী চা খাওয়ালেন। সময় কম, তাই সময় নষ্ট না করেই আবার হাঁটা শুরু করলাম। চড়াই রাস্তা, কাঁধে ব্যাগ, খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। নর্মদে হর ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছি। বিকেল সাড়ে চারটের সময় এক আশ্রমে এলাম। কিন্তু মহারাজ ছিলেন না। এখানে ১০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়লাম। কাকাজীর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে বয়স অনেক কমে গেছে। খুব

উৎসাহে উনি আগে আগে চলেছেন। ৬৫ বছর বয়সে এতো ক্ষমতা কোথা থেকে পেলেন তা মা নর্মদাই জানেন।

দিব্যানন্দজী আর কাকাজীর সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে আমি প্রতি মুহুর্তে পিছিয়ে যাচ্ছি। প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় একটি সাধুর কুঠির দেখলাম। জায়গাটার নাম পাঁচ ধারা। মহারাজ কৌপিন ধারি, নাম "ত্যাগী মহারাজ"। রাতে থাকতে দিলেন এবং খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এখানে আরো দু-জন পরিক্রমাকারি আছেন। যে ঘরটিতে আছি সে ঘরে কোনো আলোর ব্যাবস্থা নেই ফলে অন্ধকারেই সব কাজ করতে হচ্ছে। কোনো রকমে সন্ধারতি করে রাতের ভোজন পর্ব শেষ করলাম। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘুম হয়নি খুব ভোরে উঠে পড়েছি। কিন্তু ভোর থেকে লোটা নিয়ে কাকাজী কে বাইরে যেতে হচ্ছিল বার বার। বুঝলাম, ঝাল খিচুড়ি খেয়েই এই দূর্ভোগ। মহারাজ আজ ওনার আশ্রমে থেকে যেতে বললেন। কিন্তু কাকাজী থাকতে চাইলেন না কেন জানি না। ৪-৫ কিলোমিটার এসে ওনার আর চলার ক্ষমতা নেই। কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে পাশেই একটি সাধু কুঠির পেয়ে গেলাম। ঐখানে অসুস্থ কাকাজীকে নিয়ে উঠলাম। এখন সকাল ১০ টা বাজে, হাঁটা শুরু করেছিলাম সকাল সাড়ে ৮ টার সময়।

বাবুল গাছের শিকড় পিষে তার রস খেলে পেটের সব সমস্যা সেরে যায় বললেন এই আশ্রমের মহারাজ। আমরা আয়ুর্বেদ ভুলে গেছি, কিন্তু এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই। না ডাক্তার - না স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রকৃতিই এঁদের ভরসা। আজকের মতো এখানেই আমাদের পথ চলা শেষ। ...ক্রমশ ■

একাকীত্ব

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

আমি অণুরাধা রায়। সুনির্মল আমার খুব কাছের বন্ধু। সুনির্মলের সাথে আমার বন্ধুত্বের বয়স বেশীদিনের না। বন্ধুত্বটা হয়েছিল ফেসবুকের কল্যাণে। মেসেঞ্জারের তুলনায় ফোনেই বেশী কথা হতো। প্রতিদিন নিয়ম করে রোজ একবার কথা হতো। আমি চাকরির প্রয়োজনে সিলেটে একটা বাসায় ভাড়া থাকতাম। বিধবা হওয়ার পর এক মেয়েই আমার সব ভেবে, কখনো দ্বিতীয় বিয়ের কথা চিন্তাও করিনি। গতবছর মেয়েটা যখন স্কলারশিপ নিয়ে ইউ. এস. এ. চলে গেল তখন থেকে বাড়িতে একাই থাকি।

সুনির্মলের সাথে সম্পর্কটা অনেক দূর অবধি গড়িয়েছিল। ও একদিন ফোন করে বলল:

- আমি সিলেটে আসছি।

- হঠাৎ কেন?

- আসতে পারি না?

- পারো। কোথায় উঠবে হোটেলে?

- না, তুমি থাকতে হোটেলে উঠবো কেন?

- আমার এখানে? আশ্চর্য!

অবদমিত

- আসছি, রাত আটটার মধ্যে পৌঁছে যাব।

ফেসবুকে অনেকবার ছবি আদান প্রদান হয়েছে। কিন্তু ওকে কখনো সরাসরি দেখিনি। সুনির্মলের সব পছন্দের খাবার নিজে হাতে রান্না করলাম।

অনেকদিন পর খুব সাজতে ইচ্ছে করলো। একটা নীল রঙের শাড়ির সঙ্গে কপালে একটা লাল রঙের বড় টিপ পড়লাম। ফোন করে আমার বাসার লোকেশনটা জানালাম সুনির্মলকে।

রাত দশটায় বাসার কলিং বেল বেজে উঠলো।

দরজা খুলে দিতেই সুনির্মলের হাসিমাখা মুখটা দেখতে পেলাম। সুনির্মল রাজশাহীতে একা থাকে। বছর সাতেক হলো ওর বউ ক্যান্সারে মারা গেছে। ওর এক ছেলে আছে; ছেলে – ছেলের বৌ ঢাকায় থাকে।

ঘরে ঢোকার পরই শুরু হলো ওর স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসঃ

- বাহ, তুমি তো ছবির চেয়েও বেশী সুন্দর দেখতে!

- বাজে কথা বাদ দাও। এখন ফ্রেশ হয়ে নাও। রাত হয়েছে, আমি খাবার রেডি করছি।

- আচ্ছা।

ওর সব পছন্দের খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম। এটা দেখা মাত্রই ওর আনন্দ দেখে কে!

- বাহ্, এত কিছু! বেকার তোমার ঝামেলা বাড়ালাম।

- না, না তেমন কিছু না। কোনো দরকারে এসেছো?

- না, তোমাকে দেখতে। আচ্ছা, অণু একটা কথা বলবো?

- দুটোও বলতে পারো।

- আমরা কি নতুন করে শুরু করতে পারি? দেখ, অস্ত গিয়েছে শরীরের চাহিদা, এই বয়েসে শুধুই প্রয়োজন একটু সঙ্গ। এই বয়সে হিউম্যান টাচ খুব বেশী দরকার। এই একাকীত্বে তোমার শরীরটা না; তোমার সঙ্গটা চাই। আমি আর একা থাকতে পারছি না। আমি খুব ক্লান্ত।

- ওহ্, ভাতটা বেড়ে দিচ্ছি। তরকারিগুলো তুমি নিজে তুলে নাও। যেটা মন চায় খাও। আজ সব খেয়ে উঠতে হবে কিন্তু।

- তুমি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

- এতদিন পরে কি সেটা ভালো দেখাবে? সকলে কি বলবে?

- লোকে কি বলল তাতে কিছু যায় আসে না। একটা জীবনে আমরা কতটা ভালো থাকবো সেটা একান্তই আমাদের নিজস্ব। তুমি সম্মতি দিলে আমি আমার ছেলেকে জানাবো। তুমিও তোমার মেয়েকে জানাতে পারো।

- সেটা পরে দেখা যাবে। তুমি কথা না বলে খেয়ে নাও

- সেদিন যে গানটা শুনিয়েছিলে সেটা একটু শোনাবে?

- কোনটা?

- শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু হে প্রিয়...

সেদিন রাতে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম ব্যালকনিতে বসে। আকাশে রুপালি চাঁদ উঠেছিল। কি স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিবেশ!

অবদমিত

পরের দিন জরুরী টেলিফোন পেয়ে সুনির্মল রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাতে ফোন করতেই, ওর নাম্বারটা সুইচড অফ দেখালো। বারবার ট্রাই করলাম তবুও লাইন পেলাম না।

দুদিন বাদে ফোন খোলা পেলাম। ওর ছেলে ফোন রিসিভ করে বলল, বাবা, আজ সকালে মারা গেছেন। সিলেট থেকে আসতে রোড এক্সিডেন্টে গুরুতর আঘাত পেয়ে আই. সি. ইউ. তে ভর্তি ছিলেন। তবে, সিলেটে কেন গিয়েছিলেন, সেটা কেউ বলতে পারছে না।

শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, যার দীর্ঘতা কেবল আমিই অনুভব করতে পারি। আসলে, আমার ভাগ্যটাই খারাপ যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই সেই দূরে চলে যায়! সুনির্মল তোমায় ভুলিনি, ভুলতে পারি না। যে একাকীত্ব ঘোচাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলে, সেই একাকীত্বেই আমি এখন খুব ক্লান্ত... ■

তারপর

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

দেশে দুটো মাত্র রাজনৈতিক দল। রক্ষণশীল ও বিপ্লবী। রক্ষণশীলদল যখন সরকারে তখন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এমন চরম আকার ধারণ করলো যে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বিপ্লবী দলের অনেক নেতা জেলে ঢুকলো। রাজার নামে কাঁদুনে ছেলেও চুপ করে ঘুমিয়ে পড়লো।

নির্বাচন আসন্ন। কিন্তু নির্বাচন হলে বিপ্লবী দলের জয় নিশ্চিত। ভাঁজ পড়লো মন্ত্রী-সান্ত্রী-সেনা প্রধানের কপালে। নির্বাচন পিছোতে হবে। জারি হল জরুরী অবস্থা।

জেলে গেল কবি-শিল্পী-লেখক-দার্শনিক-অভিনেতা-গায়ক-চারণ এবং অবশ্যই বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক। দেশ জুড়ে প্রতিবাদী চীৎকার থামলো – কিন্তু ফিসফাস বাড়তে লাগল চক্রবৃদ্ধি হারে, একদিন প্রচণ্ড চীৎকারে ফেটে পড়ার জন্য।

ঐ দিকে গোপন সভায় বসলো মন্ত্রী-সান্ত্রী-সেনা প্রধান-বড় ব্যবসায়ী। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপ্লবী দলের দু'জন নেতাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বসলেন আলোচনায়। আলোচনা হল মূলতঃ গণতন্ত্র ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনাসভা থেকে সগর্বে

ফিরলেন বিপ্লবী দলের দুই নেতা। পরদিন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেল বিপ্লবী দলের আপোষহীন সংগ্রামের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। বাধ্য হয়েছে গণতন্ত্র তথা বাক-স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে এবং সমস্ত রাজবন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে। সবাই মুক্তি পেল, বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মী-লেখক-শিল্পী-কবি-নায়ক-গায়ক সব। কেবল মাত্র একজনকে রেখে দেওয়া হল। বিপ্লবী দলের একজন নেতা। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ছাড়াও নাশকতা মূলক কাজকর্মের মামলা ছিল।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার হল। চাকরীচ্যুতরা চাকরী ফিরে পেল। কবি কবিতা লিখলো, গায়ক গাইলো মুক্তির গান, নেতা সমাজে গ্রাহ্য হল দেশনায়ক হিসেব, শিল্পী প্রেমিকার কাছে হয়ে উঠলো আদর্শ এবং কিছুদিন পরেই দেশে নির্বাচন ঘোষণা হল। সাধারণ নির্বাচন। সকলেই জানে এই নির্বাচনে বিপ্লবী দলের জয় নিশ্চিত। নিশ্চিত স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি। ও হ্যাঁ – বলতে ভুলেছি আর একটা কথা। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে বিপ্লবী দলের যে আলোচনা হয়েছিল সেই বিতর্কে বিপ্লবী দলটি ভেঙে দু'ভাগ হল।

কারণ বিপ্লবী দলের অধিকাংশই গোপন আলোচনায় রাজী ছিল না। তাদের দাবী ছিল জনগনের সামনে প্রকাশ্যে আলোচনা। দু'জন বিশিষ্ট নেতা অনেক তত্ত্ব-তথ্য-বাস্তবতা-প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করে দলের এক বড় অংশের সমর্থন আদায় করে তারপর আলোচনায় বসে। নির্বাচনের ঠিক প্রাক

মুহূর্তে বিপ্লবী দলটি দু'ভাগ হয়ে যায়। সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী দুই নামে।

সে যাই হোক নির্বাচন হল। স্বৈরশাসন পরাজিত হল। শাসন ক্ষমতা পেল বিপ্লবী, না–না সংস্কারবাদী দলটি। কারণ নির্বাচনে তারাই সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছিল। নির্বাচনের পর নতুন সরকারের দ্বারা দেশের অনেক সংস্কার সাধন হল। মানুষ – জনগন নিঃশ্বাস ফেললো স্বস্তির। কিন্তু হায় কিছুদিন খুব ভালো কাটলেও দিন যায় – মাস যায় – বছর যায় – মোহ ভঙ্গ হতে বেশি দিন সময় লাগলো না। মানুষ দেখলো বর্তমান সরকার ক্রমশঃ আগের সরকারের রূপ নিচ্ছে – আরো আগ্রাসী – আরো ভয়ঙ্কর হয়ে।

সেই যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার একজন বিপ্লবীকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেয়নি, সে বর্তমান সরকারের বিচারেও মুক্তি পেলনা। বিপ্লবী দল সংস্কারবাদী দলের সরকারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তুললো। কবি শিল্পী সাহিত্যিক আলোচনা করলো। কাগজে লেখা হল "টুইডেল ডি আর টুইডেল ডামের তফাৎ কোথায়?"

ইতিমধ্যে কুড়ি বছর গেছে কেটে। সেই বন্দী বৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তারুণ্যের তেজ কমেনি। তার স্ত্রী আসে প্রায়ই। গোপন কুঠরিতে কাচের দেওয়ালের দুপাশে দু'জন দু'জনকে দেখে। কথা হয়না কারণ শোনা যায় না। দেশ জুড়ে কিংবদন্তী বিপ্লবী নেতার মুক্তির দাবীতে উত্তাল আন্দোলন।

বর্তমান শাসক সরকার সন্ত্রস্ত। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো – একজন অচেনা সন্ত্রাসবাদী রাজভবনে বোমা নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা পড়লো। তাকে নিয়ে যাওয়া হল বিচারশালায়। রাষ্ট্রপ্রধান নিজে গেলেন সেই বিচার সভায়, চমকে উঠলেন সন্ত্রাসবাদীকে দেখে। মুখে কিছু বললেন না শুধু বিচারের ওপর রাষ্ট্রীয় স্থগিতাদেশ জারি করলেন। সেই রাতে রাষ্ট্রপ্রধানের ঘরে, কড়া নিরাপত্তায়, একটি অত্যন্ত গোপন বৈঠক হল। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিচারকদের প্রধান, সেনা প্রধান এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান বললেন এই সন্ত্রাসবাদী আর বন্দী বিপ্লবী নেতা বয়সে-চেহারায়-মুখাবয়বে কথায় চলনে অবিকল এক। প্রচার করে দাও সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসি হয়েছে। ওকে রাখো গোপন কুঠুরীতে, কড়া পাহাড়ায়। আমি কথা বলবো ওর সঙ্গে।

পরদিন সমস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হল সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসির খবর। পরের মাসে বিপ্লবী নেতা নিঃশর্ত মুক্তি পেল। তার পরের মাসে সেই নেতা দীর্ঘদিনের বিরহকাতর স্ত্রীকে বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে ডিভোর্স করলো। তার পরের মাসে নির্বাচন হল। নির্বাচনে পূর্বের শাসক দলই জয়ী হল। তার পরের বছর জনগন অতিষ্ঠ হল। তার পরের বছর বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-আন্দোলন তীব্র হল। তার পরের বছর ধরপাকড় শুরু হল। তার পরের বছর আবার নির্বাচন হল – তার পরের বছর – তার পরের বছর – তার পরের বছর – তারপর – তারপর – তারপর – তারপর... ■

কাক ও কোকিলের ঝগড়া

ওমর ফারুক চৌধুরী (বাংলাদেশ)

কু হু সুরে কোকিল
কয়

তোরা হইলি বোকা,
তোর বাসাতে ডিম পাড়িয়া
ফুটাই ছানা, দিলাম ধোকা।

কা, কা... কাকে কয়
শুনরে ওরে ভজা,
সারা শহর আমার রাজ্য
আমি হইলাম রাজা।

তোর কাজতো চুরি করা
নহি আমি চোর,
তোর মারত বড় গলা
শুনি প্রতি ভোর।

বাসার ছাদে, খাম্বার তারে
মোদের মিটিং হয়,
ঝড় ঝাপটা যতই আসুক
নেই আমাদের ভয়।

জানি আমি তোরা কেমন –
সবাই একলা একলা...
একতা থাকলে দেখা আমায়
কুহু সুরে জোটে ক'টা কোকিলা।

সারা শহর পরিষ্কার
করে আমার প্রজা,
এমন একটি কাজের কথা
বল আমারে সোজা।

তীরন্দাজে হেরে গেলেও
যায়না মোদের নিষ্ঠা,
তোরা যতই করিস চেষ্টা,
দেখিস! মাথায় কার বিষ্ঠা। ■

পাণ্ডুলিপির উদ্যোগ

শীঘ্রই আসছে পাণ্ডুলিপির পরবর্তী নিবেদন

ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত

পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে ভূতের গল্পের এক বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূতকে মানুষের ভীতির কারণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কারণে আজ অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভৌতিক গল্প পড়তে দিতে নারাজ। তাই আজকের অনেক শিশুই ভৌতিক গল্পের রস আস্বাদনে বঞ্চিত। তাদেরই জন্য, কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে, পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে চলেছে "ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত"। এই বইটির প্রত্যেক লেখক বা লেখিকা শিক্ষাজগতের সাথে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই এর প্রতিটি গল্পই মৌলিক এবং শিক্ষামূলক। যে কোন শিশুর জন্যই এই বইটি আকর্ষণীয় এবং অবশ্য পঠনীয়। আমরা সমস্ত অভিভাবকদেরও "ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত" পড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আগে নিজে পড়ুন, তারপর বাচ্চাদের হাতে তুলে দিন।

জ্বালা

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

ভাঙ্গা পা জোড়া লাগতে আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক বাকি। রাতে শুয়ে সহধর্মিনীর মাথায় অনেকক্ষন হাত বুলিয়ে, অনেক অনেক মিষ্টি কথা বলে, ঘরের তাপমাত্রা ষোল ডিগ্রীতে এনে বললাম, পা তো জুড়েই গেছে এবার একটু বাবা বিশ্বনাথের কাছে ক'টা দিন ঘুরে আসবো? কে জানতো, সহধর্মিনীর মাথার ভেতরের কড়াইতে তখনও তেলের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রী! মনে হলো বেগুনটা পাতলা ফালি করে বেসন গোলা মাখিয়ে একেবারে ছাঁকা তেলে ছেড়ে দিয়েছি। আমার আবার সুবিধা আছে, এক কানে শুনি না। যে কানে শুনি সেই পাশটা বালিশে গুঁজে একেবারে প্রসুপ্তি। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম তেল তখনও প্রায় আশি ডিগ্রীতে ফুটছে।

ছেলে অফিস বেড়িয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই প্রাতঃকালে বাড়ীর যে ঘরটাতে বসলে সবার মাথার মধ্যে সব কুচিন্তা সুচিন্তার জট গুলোর সমাধান সূত্র মেলে, সেখানে বসে শুনতে পাচ্ছি বৌমাকে সাংসারিক কাজ যা বোঝান হচ্ছে তাতে ডেসিবেলের কাঁটা একটু উচু মাত্রার দিকে ঝুঁকে আছে। ছোট ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে নিজের

ঘর খানিতে বসলাম। চা চাইবার সাহস আজ দেহ রেখেছে। একটু বাদেই সহধর্মীনি দুখানি থিন এরারুট বিস্কুট সহযোগে এক কাপ চা ধপাস করে সামনে রেখে বেড়িয়ে গেলেন। দেখে মনে হলো যেন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে তিনি রানিং ট্রেনে উঠতে যাচ্ছেন। একটা চুমুক দিয়ে বললাম চা টা যে একেবারে ঠান্ডা! রান্না ঘরের দিক থেকে পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের মাত্রা ছাড়িয়ে উত্তর এলো, সকাল ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠলে চা ঠান্ডাই হয়, তোমার জন্য বারবার গ্যাস জ্বালতে পারবো না। উত্তর দিয়ে তার মাথার তেলের কড়াইয়ের তাপমাত্রা বাড়ানো সমীচিন হবে না বুঝে মনে মনে বললাম, কাপটা হাতে করে না এনে মাথায় করে এনেই তো দিতে পারতে। তাতেই যা গরম হতো তাতে বুঝেসুঝে চুমুক দিতে হতো। নাহ! গুরুজনরা বলে গেছেন বিপদে বুদ্ধি নাশ হয়। তাই চুপ করে ঠান্ডা চা অত্যাধিক গরম মনে করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেয়ে নিলাম। চা শেষ হতেই বৌমা আমাকে লেবু দিয়ে জল চিঁড়ে দিয়ে গেল। বৌমাকে বললাম, মা, আমার আমাশয় হয়েছে তোমাকে কে বললো? সেও একটু গম্ভীর হয়ে বললো, মা আজ এটাই খেতে বলেছেন। কে জানে গত রাত্রে ঘুমের ঘোরে কোন রকম বেফাঁশ কিছু করে ফেলেছি কিনা! সোনা মুখ করে তাই খেয়ে নিলাম। তিনি বৌমাকে সারাদিনের কাজ বুঝিয়ে তাঁর স্কুলে বেড়িয়ে গেলেন। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে

হাত জোড় করে বাবা বিশ্বনাথকে বললাম স্কুল থেকে ফেরার আগে তেলটা ঠান্ডা করে দিও বাবা।

মনে মনে ঠিক করলাম আগামী দু সপ্তাহ স্বামী নয় একেবারে বৌয়ের সুসন্তান হয়ে থাকবো। ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে ঘরদোর যতটা পারলাম গুছিয়ে রাখলাম। বিকালে তিনি ফিরলেন, ঘরের চেহারাটায় একবার চোখ বোলালেন, মুখটা দেখে একটু খুশী খুশীই মনে হলো। মধু মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম চা খাবে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর কে করবে তুমি? (উত্তর শুনে মনে হলো বাবা বিশ্বনাথ আমার কথা শুনেছেন। কড়াই, তেল সব ঠান্ডা হয়েছে) বললাম তা যদি বলো তবে..., আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন না থাক, আঁশ ফল নিয়ে এসেছি তাই খাও। প্রতিজ্ঞা করেছি তিন সপ্তাহ সন্তানের মতো থাকবো, যা বলবে তাই শুনবো। তিনি একটা বড় বাটিতে করে আঁশ ফল নিয়ে এসে নিজেও বসে গেলেন। আমার মুখ টিভির দিকে। ইন্ডিয়া গুছিয়ে হারছে। ইত্যবসরে ছেলে খেলা দেখবে বলে আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসেই বললো, তোমার বেনারসের এয়ার টিকিট দেখলাম, এখনতো অনেক দাম। আমাকে যদি গত মাসে বলতে তবে কিছুটা কম দামে পেয়ে যেতাম। বুঝলাম সকালে মা সন্তানকে তার মাথা গরম ব্যাখ্যা করেছেন। সদ্য জোরা ঠ্যাং নিয়ে ট্রেনে করে লং জার্নিতে কষ্ট হতে পারে ভেবেই হয়তো ছেলে এয়ার টিকিট দেখেছিল।

এবার আর গরম ছাঁকা তেলে বেগুন নয়, সহধর্মিনীর হুঙ্কারে মনে হলো সামনে আঁশ ফল নয় একেবারে আঁশ বটি নিয়ে বসে আছেন। শুধু গলাতে কোপটা দিতে বাকি। ছেলের দৌলতে আঁশ বটির কোপ থেকে বাঁচলাম বটে তবে তার মাথার উনুনে এক কড়াই তেল টগবগ করে ফুটে চলেছে। যেকোন সময়ে আগুন ধরে যেতে পারে। ভাগ্যিস তার এক বান্ধবী বিনা নেটিশে হঠাৎ চলে এসেছিল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আগুন নিভিয়েছে। আমি মনে মনে আবার বাবা বিশ্বনাথের স্মরনাপন্ন হলাম, বাবা তেলটা একটু তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে দিও নচেৎ রাত্রে বাড়ীর পাহারাদার সাজতে হতে পারে। তার বান্ধবীর আগমনে অবশ্য এক কাপ চা পাওয়া গেল। আসলে মনে মনে একটু হলেও তো ভালবাসে। বাড়ীতে কুকুর থাকলে গৃহকর্তা তাকে পেটায় আবার আদরও করে। কুকুর বাঁচে বারো বছর। আমি তো আবার পয়ত্রিশ বছর একসাথে। মানে প্রায় কুকুরের তিন গুণ। একটু ভালোবাসা থাকবে না?

সকালে একটু তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে উঠলাম। ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় বসে আছি, পেছন থেকে ধরো বলো এক কাপ ধূমায়িত চা এগিয়ে ধরলেন। সঙ্গে দুটি ভালো বিস্কুট। মনে মনে বললাম, জয় বাবা বিশ্বনাথ তোমার জয় হোক। কথা কম কাজ বেশী। সকাল থেকে এই রীতি মেনে দেখছি ঘর সংসারের কাজ এগিয়ে চলেছে। যথা সময়ে ব্রেকফাস্টও এসে গেল। তিনি তাঁর কাজ শেষ করে স্কুলে বেড়িয়ে গেলেন।

হালচাল

ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেলাম টিকিট দেখতে। সবই এখন এ্যাডভান্সের যুগ। রেলের কোন টিকিট নেই। তা নাকি ১২০ দিন আগে সবাই কেটে নিয়েছে। গতকাল ছেলে প্লেনের টিকিটের যে দাম বলেছিল আজ তার দাম প্রায় আরো পঁচিশ শতাংশ বেশী। সেই এ্যাডভান্সের গল্প। যত আগে কাটবে তত দাম কম। যুগটাই যেন এ্যাডভান্সের। শুনেছি মেয়েরা গর্ভবতী হবার সাথে সাথে নাকি স্কুলের দরজায় ইট পেতে রাখে আর সন্তান জন্মাবার সাথে সাথে স্কুলের দরজায় লাইন দিয়ে বসে।

ভগবানেরও বলিহারী। সন্তান কবে জন্মাবে সেটা ডাক্তারকে শিখিয়ে দিয়েছে। সে দশ মাস আগে থেকেই সব বলে দিচ্ছে। আরে, কে কবে মরবে সেটা শেখাও, কিছুতেই শেখাবে না। এই একটি জায়গায় ভগবান পুরো কমিশনটা নিজে খাচ্ছেন। গেলবার পাড়ার একজনের মৃতদেহ নিয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মাশানে গিয়েছিলাম, পাড়ার কাউন্সিলার ঘজঘজ করে কি লিখে দিলেন। শ্মশানে পৌছে দেখি এক দিকে সাধারণ মৃত দেহের লাইন, গোটা আটেক মৃত দেহ লাইন দিয়ে রাখা অন্য দিকে ভি. আই. পি. চুল্লির সামনে গোটা দশেক বডির লাইন। কাউন্সিলর যে কাগজটা দিয়ে ছিলেন তাতেই অডিনারী মরা ভি. আই. পি. হয়ে গেছে। আজকাল কাউন্সিলরদের কত পাওয়ার এক কলমের খোঁচায় (মরার পর) যে কোন লোককে ভি. আই. পি. করে দিতে

পারে। দশটি মৃত দেহের সঙ্গে যে সকল শ্মশান যাত্রী এসেছেন তাঁদের সংখ্যা ও কথাবার্তা শুনে মনে হলো মৃতরা সবাই মরার পরেই ভি. আই. পি. হয়েছেন। বেচারার দল! জেনে যেতে পারলেন না যে তাঁরা ভি. আই. পি. হয়েছেন। সাধারন লাইনে গিয়ে দাঁড়ালে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ভেবে ডোমকে গিয়ে বললাম, আমাদের বডিটা এখানে নিয়ে আসবো? শুনে বলল বডি কোথায়? বললাম, ভি. আই. পি. লাইনে। বলল, না ওটা ওখানেই পোড়াতে হবে। কি জানি বাবা, ভি. আই. পি. চুল্লিতে ছ্যাঁকা কম লাগে কিনা!

বৌমাকে ডেকে বললাম, মা একটা ওলা ডেকে দেবে? যতটা পারে গম্ভীর হয়ে সে বলল – কেন? বললাম একটু শ্মাশান যাবো। আঁতকে উঠে বলল – কেন? বললাম – বুকিং করতে। সে জ্ঞিগ্যেস করলো – কিসের? বললাম – গিয়ে দেখি সেখানেও মরার লাইনের এ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়ে গেছে কিনা! সে খেপে গিয়ে বলল – দাঁড়াও মা বাড়ীতে ফিরুক, আমি সব বলে দেব। তাকে অতি কষ্টে ঠান্ডা তো করলাম কিন্তু বিপদ হলো এখন সুযোগ পেলেই "মাকে কিন্তু তোমার কথা বলে দেব বলে" – বলে ব্ল্যাকমেল করে।

ঠিক করেছি আর নয়, শুভ দিন দেখে বডিটা দান করে দেব। মরার পরে ভি. আই. পি. না হয়ে অন্তত কিছু মরনাপন্ন লোকের মধ্যে শরীরাংশ দিয়ে বেঁচে থেকেই ভি. আই. পি. হবো। ■

চিঠির মতন লেখা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবর,

সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল বলে দেখতে পেলাম তোমার চোখের দামী চশমাটা। সোনার ফ্রেম বোধহয়, তাই পছন্দ হয়নি এই সীসের হৃদয়। অত দামী চোখ দিয়ে কি দেখ, জানি না। তবে আমাকে যখন ডাকলে আজ, অনেকদিন পর বড় অবাক হয়ে গেলেম। আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করছিলে তো? কেন আর শহরে যাই না, জানতে চাইছিলে... সে কথার উত্তর তখন দিতে পারিনি। তুমি তো জানো, আমি বড় ধীর। পুরাকালে, গাছেরা যখন কথা বলত, নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা করত, তখন তাদের বলা কথাগুলো যেমন স্থির ছিল, যারা ধান ভাঙতে শিবের গীত রচত, তাদের কথা যেমন লতায় পাতায় প্রসারিত ছিল, আমার কথাও অনেকটা তেমনই। যার কথা কেবল অপর একটি গাছই বোঝে, যেমনটা বুঝত পুরাকালের মানুষজনেরা, সেইরকম অনেকটা।

অনেক দিন আগে পড়েছিলেম। ভালো থাকা কিরকম জানো? অনেকটা সেই জেলের কয়েদির প্রিয় ছবিটার মত। আল্কাট্রাস নামক কালান্তক জেলে যে বন্দী হয়ে ছিল দীর্ঘ বছর। তারপর যখন একদিন কড়া জিজ্ঞাসাবাদের মাঝে এক

সজীবতা

ডিটেকটিভ যখন হঠাৎই তাকে বললে, "আমার কাছে তোমার কিছু আছে," বলে তাকে দিলে পুরোন, হলুদ হয়ে আসা একখানা বিস্মৃতপ্রায় মুখের ছবি, তখন তার মুখের যে আলো, সেইটে ভালোবাসা, সেটাই ভালো থাকা। আকাশের ঠিকানা। কিংবা, সেই হতভাগিনী মেয়েটি যে সালেম উইচ ট্রায়ালের মশালের আলোয় দেখেছিল মৃত্যু, উন্মত্ত জনতার জিঘাংসা যার শরীরে দেগে দিয়েছিল ক্ষতের বিভীষিকা, তার প্রেমিকের হাতে রয়ে যাওয়া তারই পোষাকের শেষ টুকরোটা ভালো থাকা।

প্রীতি এক নির্জন দ্বীপ। যে রোগাপানা, চোখে-চশমা মেয়েটি বাড়ি ফেরার আপ্রাণ চেষ্টায় ট্রেন ধরে, যার সাথে কথা হয় সমাজ-সংসারের, গান-সিনেমার, যার সাথে কখনো-সখনো, আলেকালে মিলে যায় কক্ষপথ, দুজনে ফিরি এক জানলার ধার ভাগ করে নিয়ে, সে বোঝে প্রীতির মানে। ট্রেন ছুটে চলে নিজের গতিতে, আর আমরা চলি আমাদের প্রীতিতে।

আমার লেখার টেবিলে একটা জলের গেলাস আছে। তামার গেলাস। মা তাতে জল ভরে রাখে আমার জন্য। তামার গেলাসের বড় ঝামেলা। তেঁতুল দিয়ে মাজতে হয়। আমি নিজে মাজিনি কোনদিন। মা মেজে ঝকঝকে করে আমায় দেখায়। আমি তাতে জল খাই, ঠাণ্ডা জল। মায়ের মুখটা তখন কি উজ্জ্বল লাগে। আমি ঐ গ্লাসটা বড় ভালোবাসি। ভালবাসি আমার কলম আর পুরোন ঢেপলু ল্যাণ্ডলাইন ফোনটাকে। ওটা আমি ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না এখানে। আমার এক

বন্ধু ফোন করে মাঝে মাঝে। আমরা ফোনে আঁকি। সে একটা করে দৃশ্য বলে আর আমি শুনে শুনে কাগজে আঁচড় কাটি।

আঁকার কথায় মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করছিলে না, তোমাদের সোস্যাল মিডিয়ায় কত গ্রুপ। আঁকার ছবি সেসব গ্রুপে দিই না কেন? কত নাম হবে আমার, কত লোক জানবে, মান্যিগণ্যি করবে! কেন দিই না জান? কারণ দিলেই একটা উল্লাসপ্রবণ হইহল্লাকারী দল আমার পিছনে পড়ে যাবে। কেউ কেউ ভালো বলবে, কেউ বলবে খারাপ, কেউ মানবে, কেউ সাধবে, কেউ বাঁধবে, ওই নিয়েই মেতে যাব আমি। দুঃখ পাব, সুখ হবে, ক্ষেপে উঠব, মেতে যাব। আঁকা যাবে চুলোর দোরে। ক্যানভাসের নিষ্পাপ নির্জনতা প্রয়োজন। সৃষ্টি বড় লজ্জাশীলা, চড়া আলোতে সে দেখা দেয় না। তাই ত আমি চাঁদের ঘরে থাকি।

তোমরা এত কিছু জান, এত কিছু পারো, এত নাম, যশ, অর্থ তোমাদের। কিন্তু মানুষের ভেতরের মানুষটা যে কেন এত গরীব! আমার দেখলে হাসি পায়। আমি যে পাড়ায় থাকতেম, তুমি তো জানো... সেই বাঙালিপাড়ায় যখন প্রথম আগরওয়ালরা বাড়ি কিনল, আমরা তাদের আপন করেই নিয়েছিলুম। ওদের উনিশ বছরের বৌটাকে যখন ওর স্বামী পণের দায়ে গলা টিপে মারছিল, আর শাশুড়ী মেয়েটার হাত দুটো শক্ত করে ধরেছিল, তখন আমি দেখে ফেলেছিলাম। পুলিশ এলো, দেখল, চলে গেল। মেয়েটার বাবা হম্বিতম্বি করে জানাল সে আগেই দশ লাখ টাকা দিয়েছে, আর দিত না কিছুতেই। আমি দেখলুম বসে

বসে। কিছু বলতে পারিনি। মাস দু'এক পরে ছেলের আবার ধুমধাম করে বিয়ে হলো। আবার আবার পণ, লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমার সেসবে কিছু আসে যায় নি। আমি কি জানতে পেরে ভয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম বলতে পার?

ঐ মেয়েটার আরো দুই বোন আছে।

কি হত যদি এই মেয়েটার বিয়ে না দিত ওর বাবা? না হয় সেলাই করত, রান্নার কাজ নিত, পালিয়ে যেত কোন অজাত-কুজাতের ছেলের সঙ্গে... বাঁচত তো...

জীবন বড় মূল্যবান। যত বয়স হচ্ছে, বুঝতে পারি।

পৃথিবীতে একের তিন ভাগ রেনফরেস্ট দরকার, দরকার কোটি কোটি মৌমাছির, দরকার সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটনের, মানুষের, মানবসভ্যতার বেঁচে থাকার জন্য। এরা না বাঁচলে জীবজগত বাঁচবে না, আর জীবজগত না থাকলে মানুষও থাকবে না। কিন্তু এদের বাঁচার পথ রাখেনি মানুষ। তারাশঙ্করের মত এখন বলতে ইচ্ছা হয়, 'ভগবান ছিল, মানুষ তাকে মেরে ফেলেছে!' এসব কথা ভাবলে আর ভালো থাকি না, ভিতরটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন গান করি, গান শুনি। এখানে আমাকে কেউ কিছুতে বাধা দেয় না। নিজের ঘর রয়েছে। বারান্দা, তাতে আমার প্রিয় ফুলেল ক্যাক্টাস, অ্যাজেলিয়া। যখন প্রথম এসেছিলেম, স্বেচ্ছায়, আজ থেকে তিন বছর আগে মাকে নিয়ে, তখন আমি সবে চল্লিশ। তখনও এই "সাঁঝবাতি" বৃদ্ধাশ্রমের ম্যানেজার গাঁইগুঁই করেছিলেন। ওদের রেসিডেন্টরা সবাই পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু

সজীবতা

টাকার কি অসীম গুণ! গুণে গুণে ছ'মাসের ভাড়া অগ্রীম দেওয়াতে আর কিচ্ছুটি বলেননি ম্যানেজার। এখন ত অনেক বোর্ডারের সাথেই কথা হয়। কার ছেলে আর আসেনা, কার মেয়ে বিদেশে, কার ছেলে বৌয়ের ভেড়া, কার মেয়ে স্বার্থপর, এইসব। আমি শুনি, মানুষ দেখি, ওটাই ভালো লাগে। জানোই তো, মানুষ দেখা আমার এক নেশা। সেই নেশার জন্যই এখানে এসে উঠেছি। মিরিকের এই জায়গাটা থেকে পাহাড় বড় কাছে, আমার ভালো লাগে। নাহ, আমায় কোন ছেলে বা মেয়ে বা বর কেউ দিয়ে যায়নি এখানে। সেগুলোর জন্য তো বিয়ে নামক বখেড়াটা লাগে। সেটায় তো আমি নেই। আমি নিজেই এসেছি। আসার ইচ্ছা ছিল। এসে যে ভালো করেছি তা এখন বুঝি।

এখানে মানুষ আমায় চেনে কম, তাই কথা বেশি বলতে হয় না। প্রশ্ন করতে হয় না, তাই মিথ্যেও শুনতে হয় না। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জায়গা কম। পার্বত্য নিস্তব্ধতা ঢেকে দিয়েছে শহুরে জীবনের মলিনতা। তোমার মুখে যেটা বড় স্পষ্ট এখন। তোমার বড়লোকী চশমার একাকী কাচ ফুঁড়ে চোখের তলার ভাঁজগুলো বয়ে যাওয়া জীবনের ছবিটা তুলে ধরেছিল সেদিনের একপলকের দেখাতেই। তোমার দামী বাড়ী, গাড়ী আর সাজুনে বৌ-মেয়ের জাল পেরিয়ে তুমি এই পাহাড়ে যেটা খুঁজতে এসেছিলে, আমাকে যা বলতে চেয়েছিলে, সেটা আমি পেয়েছি জানো। তোমায় বলতে পারিনি, বাধো বাধো ঠেকেছিল।

সজীবতা

আমার মধ্যে কোন নৈরাশ্য নেই। নৈরাশ্য আসলে এক কাপুরুষতা। আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বখাটে ছেলেটারও চুলে পাক ধরেছে এখন। যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, দেখি প্রতিদিন নতুন নতুন ছেলেমেয়ের মুখ, স্কুলে যাচ্ছে, খেলতে যাচ্ছে, হাসি, আনন্দের ছবি দেখি, বুঝি জীবন কালস্রোতে নিজের গতিপথ নিজেই স্থির করে ঠিকই, এ সত্য অমোঘ, মানুষ যদি তাকে সেই সুযোগ দেয়। এখানে ২৫শে বৈশাখের ছোট গানের আসরে সেই ছেলেবেলার রবীন্দ্রজয়ন্তীর স্বাদ পাই। তোমাদের ঐ সাজানো গোছানো অনুষ্ঠানে তাই যাই না আর।

অনেক কথা বলে ফেললুম, কিছু মনে কোরো না। জানো তো, আমি এরকমই। তোমাকে অনেকদিন পর দেখে ভালো লাগল। পাহাড়ে এসো আবার। সফলতা থেকে বেরিয়ে, কিছুদিনের জন্য হলেও সার্থকতার খোঁজ কোর, দেখবে ভালোই লাগবে। যখন প্রতি মিনিটে একশোটা গাছ কাটা পড়ছে, সেই মিনিটে কবিতাও লেখা হচ্ছে কত শত, ঠিক সেই মুহূর্তে ধর্ষিতা হচ্ছে কত নারী, সেই একই মিনিটে প্রেম গড়ে উঠছে মানুষে মানুষে। জীবন রহস্যময়, কি হয়, কেন হয়... বোঝা খুব মুশকিল, তাই আর বোঝার চেষ্টা করি না। বুকের ভিতরে জমে থাকা একটা নবমীর রাত শুধু মাঝে মাঝে ডেকে যায়।

তোমাদের ওই পোড়া সাফল্যের শব্দশহরকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি স্মার্টনেস আর অন্যের মুখ কালো করা অহংকারকে। ঘৃণা করি আমার নিজের কাপুরুষোচিত নির্বিরোধী চরিত্রকেও।

সজীবতা

আমার বাগানের চেরি আর টমেটো গাছটা আমার বন্ধু। আমার ঘরের জানলা দিয়ে যে দেবদারু গাছটা দেখা যায়, তার মাথার ওপর যখন চাঁদ ওঠে, সেই আলোয় যে গান থাকে, সেই গান আমার সঙ্গী। ওদের কাছে ক্ষমা চাই মাঝে মাঝে আমার পূর্বাপর সকল অপরাধের জন্য।

প্রার্থনা করি যতদিন বেঁচে আছি যেন সাধ্যমত মানুষকে ভালোবাসতে পারি। কাজটা খুবই কঠিন, সন্দেহ নেই। তবু যতটুকু পারা যায়।

আমি কেমন আছি? আমি ভালো আছি।

ভালোবাসা জেনো।

সর্বজয়া। ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাট ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও থাকা চাই। ছবির সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: সেপ্টেম্বর সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই অগাস্ট, ২০১৯।

শীঘ্রই আসছে পাণ্ডুলিপির পরবর্তী নিবেদন

ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত